আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. কর্তৃক রচিত “রফউল মালাম আ‘নিল আয়িম্মাতিল আ‘লাম” কিতাবটির সারসংক্ষেপ।

ইমামগণের সমালোচনা বৈধ নয়

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তার কাছে আমাদের আত্মপ্রবঞ্চনা এবং আমাদের অকৃতকর্মের কুফল থেকে মুক্তি কামনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। মুহাম্মাদ সা. আল্লাহ তাআলার রাসূল।

সকল মুমিনের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পর সকল মুমিনের সাথে সদাচরণ করা আবশ্যক। এর বর্ণনা পবিত্র কোরআনেও আছে। বিশেষ করে ওলামায়ে কেরামদের সাথে সদাচরণ করা তো একান্ত আবশ্যক। কারণ তারা হলেন আম্বিয়াদের ওয়ারিশ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নক্ষত্ররূপে বানিয়েছেন। আর সকল মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ছিলেন হেদায়েতপ্রাপ্ত এবং বিজ্ঞ।

একথা স্মরণ রাখা আবাশ্যক যে, সর্বজনবিদিত ওলামায়ে কেরামদের কেউই ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহর রাসূল সা. এর সুন্নাতের পরিপন্থী কোন কাজ করেন নি। চাই সেটা সাধারণ থেকে সাধারণ ব্যাপারেই হোক না কেন।

একথাও সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহর রাসূল সা. ব্যতীত যে কারো সকল কথা ও বক্তব্য বিনা বাক্যব্যয়ে শিরোধার্য নয়। তাই কোন ক্ষেত্রে যদি কারো এমন কোন বক্তব্য পরিলক্ষিত হয় যেটা রাসূল সা. এর সহীহ হাদীসের পরিপন্থী নিশ্চয় সেটার ক্ষেত্রে তার জন্য কোন কোন যুক্তিযুক্ত এবং শরীয়ত অনুমোদিত অজুহাত অবশ্যবই থাকবে।

আমরা যদি সেসব অজুহাতগুলো তালাশ করি তাহলে সেগুলো আমরা তিন ভাগে বিভক্ত দেখতে পাই—

১। যে হাদীসটি আমরা রাসূল সা. বলেছেন বলে বিশ্বাস করি তিনি সেটাকে রাসূল সা. এর ভাষ্য বলে ভাবেন না।

২। আমরা যে মাসআলাটিকে সংশ্লিষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে চাই তিনি উক্ত মাসআলাটির জন্য এই হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য ভাবেন না।

৩। অথবা আমরা যে বিধানটি প্রযোজ্য করতে চাচ্ছি তিনি সেটিকে রহিত বলে বিশ্বাস করেন।

এগুলো হচ্ছে একেবারে মৌলিক কারণ। এর কিছু শাখাগত কারণও বিদ্যমান আছে। আমরা সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাবো। ইনশা-আল্লাহ।

প্রথম কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো

প্রথম যে কারণটি ছিল সেটা ছিল, “যে হাদীসটি আমরা রাসূল সা. বলেছেন বলে বিশ্বাস করি তিনি সেটাকে রাসূল সা. এর ভাষ্য বলে ভাবেন না।” এর অনেক কারণ হতে পারে। নিম্নে তার বর্ণনা দেওয়া হলো।

প্রথম কারণ:

হয়ত উক্ত হাদীসটি তার হস্তগত হয় নি। তাই তিনি যে সহীহ হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা তিনি অন্য কোন আয়াত বা হাদীসের বচনভঙ্গি থেকে ইজতেহাদের মাধ্যমে দিয়েছেন। অথবা তিনি কেয়াস, ইস্তেসহাব বা অন্য কোন শরঈ দলীলের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কিন্তু যে হাদীসটি আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তার সিদ্ধান্ত সেটার বিপরীতে অবস্থান করছে। ফলে আমরা যা অনুভব করতে পারছি তা হল, এক হাদীসের সাথে তার সিদ্ধান্তের মিল রয়েছে আর অন্য হাদীসের সাথে তার বক্তব্যের বৈপরীত্ব পরিস্ফুটিত হচ্ছে। তবে মিলের চেয়ে বৈপরীত্বটাই স্পষ্ট। এজন্য আমরা তার সিদ্ধান্তটিকে হাদীসের বিপরীত বলে মনে করি।

আমরা যখন কোন মুজাহিদের এমন বক্তব্যের পর্যালোচনা করি তখন এই কারণটিই সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত করি। কারণ সকল হাদীস সংরক্ষিত করা কারো পক্ষে সম্ভব না। কারণ রাসূল সা. এর যুগে সাহাবদের অবস্থা এমন ছিল যে, কোন এক মজলিসে রাসূল সা. কোন মাসআলা বর্ণনা করতেন বা ফতোয়া দিতেন তখন দেখা যেত যে তার উক্ত মজলিসে অনেক সাহাবীই অনুপস্থিত। এর পরে আবার কোন মজলিসে কোন মাসআলা বর্ণনা করতেন বা ফতোয়া দিতেন তখন দেখা যেত যে আগের মজলিসে যে সাহাবীরা উপস্থিত ছিলেন তারা অনেকেই এখানে নেই আবার আগের মজলিসে যারা ছিলেন না তাদের অনেকেই এখানে উপস্থিত আছে। তাই সাহাবায়ে কেরামদের অনেকই অনেক মাসআলা জানতেন যা অন্য সাহাবী জানতেন না। তবে তাদের ফজিলত অনেক বেশি যারা রাসূল সা. এর ইলেমের অংশ বেশি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কারো জন্য এটা সম্ভব হয় নি যে, তিনি রাসূল সা. এর সকল হাদীস সংরক্ষণ করতে পেরেছেন।

আমরা এ বিষয়টি স্বয়ং খোলাফায়ে রাশেদীনদের থেকেও পরিলক্ষিত করি। অথচ হযরত আবু বকর রাযি. ছিলেন রাসূল সা. একান্ত সঙ্গী। সর্বদাই তার সঙ্গে থাকতেন। এজন্য রাসূল সা. অনেক সময়েই বলতেন, “প্রবেশ করলেও আমি আবু বকর ওমর একত্রে; আর বের হলেও আমি আবু বকর ওমর একত্রে।” (অর্থাৎ, রাসূল সা. এর সাথে তাদের সহাবস্থান এতটাই গভীর ছিল যে, তারা প্রায় সময়ই একত্রে সময় কাটাতেন।)

এতদ্বসত্ত্বেও যখন হযরত আবু বকর রাযি. কে দাদীর সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল তখন তিনি বললেন, আমি তো কোরআনেও এই মাসআলার ফয়সালা দেখতে পাচ্ছি না আর রাসলূ সা. এর কোন হাদীসেও দেখতে পাচ্ছি না। তবে আমি লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে দেখব। আবু বকর রাযি. লোকদেরকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে পরে হযরত মুগীরা ইবনে শু‘বা এবং মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা রাযি. দাড়িয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বললেন যে, রাসূল সা. দাদীকে একষষ্ঠমাংশ দিয়েছেন। ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকেও এমন একটি বর্ণনা আছে। পরবর্তীতে এর উপর সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, এই তিনজন সাহাবীদের তুলনায় খোলাফায়ে রাশেদীনরা কত উঁচু মর্যাদার ছিলেন! যেমন ছিলেন ইলমে তেমন ছিলেন আমলে। তা সত্ত্বও তাদের কারো কারো কাছে এ বিষয়ের ইলেম ছিল না।

অনুরূপ হযরত ওমর রাযি. এর কারো ঘরে প্রবেশের অনুমতি গ্রহণের সুন্নত সম্পর্কে জানা ছিল না। যখন হযরত আবু মূসা রাযি. তাকে হাদীস বর্ণনা করলেন তখন তিনি জানতে পারলেন। অথচ হযরত ওমর রাযি. ছিলেন অনেক বেশি হাদীস বর্ণনাকারী।

অনুরূপ হযরত ওমর রাযি. এর কাছে আরো একটি বিষয়ে রাসূল সা. এর হাদীস হস্তগত হয়েছিল না। স্বামীকে যদি কেউ হত্যা করে এর ফলে যদি হত্যাকারীদের পক্ষ থেকে রক্তপণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এই রক্তপণ থেকে স্ত্রী কোন অংশ পাবে কি না। হযরত ওমর রাযি. এর রায় ছিল যে, না; এতে স্ত্রীর জন্য কোন প্রাপ্য নেই। কারণ, রক্তপণের হকদার হল রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন। স্ত্রী তো আর রক্তের আত্মীয়ের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই স্ত্রী স্বামীর রক্তপণ থেকে কোন অংশ পাবে না।

অবশেষে যখন হযরত যাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান কিলাবী রাযি. হযরত ওমর রাযি. এর কাছে রাসূল সা. এই হাদীস লিখে পাঠালেন যে, রাসূল সা. আশয়াম যাবাবী রাযি. এর স্ত্রীকে তার রক্তপণের অংশ দিয়েছেন। তখন ওমর রাযি. আপন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন এবং বললেন, যদি আমার কাছে এই হাদীস না পৌঁছত তাহলে আমি হাদীসের বিপরীত সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলতাম! (ফলে আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিতাম। আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন।)

স্বয়ং হযরত ওমর রাযি. এর কাছে আরো কয়েকটি বিষয়ে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়, যে ব্যাপারে রাসূল সা. এর হাদীস তার কাছে স্পষ্ট ছিল না। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করছি না।

তবে ওমর রাযি. যে হাদীসের বিপরীত ফয়সালা দিয়েছিলেন বা হাদীসে বর্ণিত ভাষ্যের সিদ্ধান্ত ব্যতীত ভিন্নভাবে ফয়সালা দিয়েছিলেন এটা তার জন্য কোন গুনাহ বা কোন তিরষ্কারের কারণ বলে ধর্তব্য নয়। কারণ, তাঁর কাছে তো আর হাদীস পৌঁছেছিল না। কিন্তু যখনই হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপন রায় পরিত্যাগ করে রাসূল সা. এর সুন্নাহর অনুসরণ করেছেন।

অনুরূপ হযরত ওসমান রাযি এর কাছে এই হাদীসটি পৌঁছেছিল না যে, স্বামী যে ঘরে মারা যাবে স্ত্রীকে সেই ঘরেই ইদ্দত পালন করতে হবে। তিনি তখনই এই বিষয়টি জানতে পারলেন যখন হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর বোন ফুরাইআ' বিনতে মালেক রাযি. এর স্বামী যখন মারা গেল তখন তার স্বামী যে ঘরে মারা গিয়েছিল সে ঘরেই রাসূল সা. তাকে ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তখনই তিনি আপন সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে রাসূল সা. এর সুন্নাহর উপর আমল করেছেন।

অনুরূপ হযরত আলী রাযি. এরও অনেক হাদীস জানা ছিল না। তিনি বলেন, আমি রাসূল সা. এর কাছ থেকে যে হাদীসগুলো শুনেছি সেগুলো আমাকে উপকার সাধন

করেছে। কিন্তু এর পরেও আমার অনেক কিছু অজানা রয়েছে। সেগুলো যদি রাসূল সা. থেকে কেউ বর্ণনা করে তাহলে আমি তাকে কসম করে বর্ণনা করতে বলি। সে যদি কসম করে বর্ণনা করে তাহলে আমি তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করে নেই।

অনুরূপ হযরত আলী রাযি. এবং ইবনে আব্বাস রাযি. এর রায় ছিল, যদি কোন গর্ভবতী নারীর স্বামী মারা যায় তাহলে তার ইদ্দত হবে দুই ইদ্দতের দীর্ঘতমটি। অর্থাৎ, সন্তান প্রসব এবং চারমাস দশদিন। এই দুইটির যেটি দীর্ঘতম হবে সেটিই হবে উক্ত স্ত্রীর ইদ্দত। কিন্তু তাদের এই হাদীসটি জানা ছিল না যে, রাসূল সা. হযরত সুবাইআহ আসলামী রাযি. এর ব্যাপারে রাসূল সা. নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তার ইদ্দত হবে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। চাই সেটা চারমাস দশদিনের কমেই হোক না কেন।

অনরূপ হযরত আলী রাযি. যায়েদ রাযি. এবং ইবনে ওমর রাযি. এর রায় ছিল যে, কোন স্ত্রী যদি বিবাহের সময় মহর নির্দিষ্ট না করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এর পর যদি স্বামী মারা যায় তাহলে এই স্ত্রী কোন মহর প্রাপ্ত হবে না। কিন্তু তাদের একথা জানা ছিল না যে, রাসূল সা. বিরওয়া বিনতে ওয়াশিক রাযি. এর ব্যাপারে ফয়সালা দিয়েছিলেন যে, সে উপযুক্ত মহর পাবে।

এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হল মাত্র। এমন দৃষ্টান্ত সাহাবায়ে কেরাম থেকে অনেক বর্ণিত রয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যদের থেকে এমন ঘটনা যে কত ঘটেছে তার ইয়ত্তা নেই।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, এই যে সাহাবায়ে কেরাম— তারা ছিলেন এই উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী ও প্রতিভাবান। তাই যারা তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের কাছে অনেক বিষয় অজানা থাকা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

তাই একথা একেবারেই স্পষ্ট যে কেউ এই দাবী করতে পারে না যে, আমার কাছে সকল হাদীস সংরক্ষিত রয়েছে বা অমুক ইমামের কাছে সকল হাদীস সংরক্ষিত রয়েছে।

অনুরূপ একথা বলারও সুযোগ নেই যে, বর্তমান আধুনিক কালে সকল কিতাবই তো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাই এখন আর কোন হাদীস অজানা নেই। সবগুলোই আমাদের সামনে এসে গেছে। কারণ, আজ যেসকল হাদীসের কিতাব লিপিবদ্ধ আকারে আমরা দেখতে পাচ্ছি তার অধিকাংশই লিপিবদ্ধ হয়েছে ইমামগণের যুগ অতিক্রম করার পর। তাছাড়া রাসূল সা. এর সকল হাদীস যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে এমন দাবী করারও কোন সুযোগ নেই।

এর পরেও যদি আমরা মেনে নেই যে, রাসূল সা. এর সকল হাদীস লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তবুও একথা বলা যায় না যে, অমুক ব্যক্তি এসব কিতাবের সকল হাদীস সম্পর্কে জ্ঞাত। কারণ, কোন ব্যক্তির জন্য সকল কিতাবের হাদীস একযোগে স্মরণ রাখা সম্ভবপর নয়। বরং একথা স্পষ্ট যে, পূর্ববর্তীদের কাছে আমাদের চেয়ে হাদীসের ভাণ্ডার অনেক বেশি সংরক্ষিত ছিল। কারণ, তাদের কাছে অনেক সংক্ষিপ্ত সনদে স্পষ্টভাবে যে হাদীস পৌঁছেছিল তার অনেক হাদীসই আমাদের কাছে সেভাবে পৌঁছে নি। দেখা যায় যে,

তাদের কাছে অনেক হাদীস সহীহ্ সনদে পৌঁছে থাকলেও তা আমাদের কাছে মাজহুল বা মুনকাতি' রূপে পৌঁছেছে অথবা আমাদের কাছে তা মোটেই পৌঁছে নি। আসলে তাদের অন্তরগুলোই ছিল তাদের লাইব্রেরী। তারা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তার তুলনায় তাদের অন্তরগুলো ছিল বিশাল সমূদ্রসম।

তবে এখানে একথা কেউ বলতে পারবে না যে, যখন কারো কাছে সকল হাদীস সংরক্ষিত ছিল না তাই তিনি মুজতাহিদও হতে পারবেন না। কারণ, যদি মুজতাহিদ হওয়ার জন্য এই শর্ত আরোপ করা হয়ে থাকে তাহলে এই উম্মাতের মধ্যে কোন মুজতাহিদ খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেটা একটা সর্বজনবিদিত বিষয়ের বিপরীত মন্তব্য। বরং বলতে হবে যে, যার কাছে প্রায় সকল হাদীসই সংরক্ষিত রয়েছে তিনি মুজতাহিদ। যদি অসংরক্ষিত কিছু থেকে থাকে তা যতকিঞ্চৎ।

দ্বিতীয় কারণ:

প্রথম মৌলিক কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখাগত কারণ থেকে দ্বিতীয় কারণ হল, মুজতাহিদের কাছে যিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা উক্ত বর্ণনাকারীর বর্ণনাকারীদের মধ্যে এমন কেউ রয়েছেন যার ব্যাপারটি মুজতাহিদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে বা তিনি মিথ্যাবাদীতার অভিযোগে অভিযুক্ত অথবা তার স্মরণশক্তিতে কোন ত্রুটি ছিল যার কারণে উক্ত হাদীসটি তার কাছে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে নি। তাই তিনি উক্ত হাদীসটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন নি।

অথবা এটিও কারণ হতে পারে যে, হাদীসটি তার কাছে মুনকাতি' রূপে হস্তগত হয়েছে অথবা হাদীসের শব্দের মধ্যে কোন শব্দ অস্পষ্টভাবে তার কাছে পৌঁছেছে। কিন্তু এই হাদীসটিই অন্য মুহাদ্দিস বা মুজতাহিদের কাছে মুত্তাসিলভাবে সংরক্ষিত রয়েছে অথবা তার কাছে যারা বর্ণনা করেছেন তারা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হিসেবে সমাদৃত। তাই যার কাছে এই হাদীসটি নির্ভরতার কোন সূত্রে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে তিনি সেটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন নি। পক্ষান্তরে যার কাছে হাদীসটি নির্ভরযোগ্যতার সূত্রে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নি তার কাছে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে। ফলে যিনি হাদসিটি গ্রহণ করেন নি তার ফতোয়ার সাথে হাদীসটির মিল পাওয়া যায়নি।

এধরনের মতপার্থক্য তাবেঈন এবং তাবে' তাবেঈনদের মধ্যে খুব বেশি পরিলক্ষিত হয়। বরং পূর্বোল্লিখিত কারণের চেয়ে এই কারণটি অধিক ব্যাপক। এর কারণ হল, মুজতাহিদীনদের সময় হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু বর্ণনার ক্ষেত্রে কারো কাছে বিশুদ্ধ সনদে হস্তগত হয়েছে আর কারো কাছে বিভিন্ন আনুসঙ্গিকতার কারণে বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হয় নি। তাই এক মুজতাহিদের মত অন্য মুজতাহিদের হাদীস সমর্থিত মতের সাথে অমিলের কারণে কাউকে তিরষ্কার করার কোন সুযোগ নেই।

তাছাড়া ইমামগণের অনেকেই একথা বলেছেন যে, এটা আমার কথা। বাকি কোন কোন হাদীসে এমনটা বর্ণিত আছে। যদি বর্ণিত হাদীসটি সহীহ হয় তাহলে সেটাই হবে আমার সিদ্ধান্ত।

তৃতীয় কারণঃ

প্রথম মৌলিক কারণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট তৃতীয় কারণ হল, এক মুজতাহিদ হাদীসটিকে কোন একটি বিশেষ কারণে দুর্বল বলে আখ্যা দেন। কিন্তু এই কারণটি অন্য মুজতাহিদের কাছে দুর্বলতার কারণ বলে ধর্তব্য নয়।

এমন মনে করার অনেক কারণ থাকতে পারে। যেমন-

ক- কোন বর্ণনাকারীকে এক মুজতাহিদ গ্রহণযোগ্য বিশ্বাস করেন কিন্তু অন্য মুজতাহিদ তাকে গ্রহণযোগ্য বলে ভাবেন না। এটা হচ্ছে রিজাল সাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। তাই যার কাছে গ্রহণযোগ্যতার কারণ স্পষ্ট নয় তিনি উক্ত হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে যার কাছে গ্রহণযোগ্য তার কাছে অগ্রহণযোগ্যতার বর্ণিত কারণটি যে ঠিক নয়- তা প্রমাণিত। তাই তিনি এই হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। ফলে দেখা যায় যে, কোন কোন মুজতাহিদের মত হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় আবার কোন কোন মুজতাহিদের মত হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় না।

খ- অথবা বর্ণনাকারী যার থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি তার থেকে শুনেছেন কিনা তা নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়া। এক মুজতাহিদ বলেন যে তিনি তার কাছ থেকে শুনেন নি। আর অপর মুজতাহিদ বলেন যে, তিনি তার কাছ তেকে শুনেছেন। তাই যিনি শুনেছেন বলে বিশ্বাস করেন তার কাছে অপর মুজতাহিদের রায়কে হাদীসের সাথে সংগতিপূর্ণ মনে করেন না।

গ- কোন কোন মুহাদ্দিসের জীবনে সক্ষমতা ও অক্ষমতার দুইটি পর্ব থাকে। তিনি যখন স্মৃতিশক্তিতে পারঙ্গম ছিলেন তখন যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন সেগুলো গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যখন তার স্মৃতিশক্তিতে ত্রুটি চলে আসল তখন তিনি যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন সেসব হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এখন বিষয় হচ্ছে তার সক্ষমতার অবস্থার হাদীসের সাথে অক্ষমতার হাদীসের মিশ্রণ ঘটে যাওয়া হাদীস অগ্রহণযোগ্যতার কারণ বলে বিবেচ্য। কোন মুজতাহিদের কাছে যদি এ বিষয়টি স্পষ্ট থাকে যে, অমুক হাদীস তার সক্ষমতার সময় বর্ণনা করেছিলেন। আর অপর কোন মুজতাহিদের কাছে যদি এ বিষয়টি স্পষ্ট না থাকে তাহলে যিনি হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন তার কাছে অপর মুজতাহিদের রায়কে হাদীসের পরিপন্থী মনে হতে পারে।

ঘ- কোন সময় মুহাদ্দিস হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি ভুলে যান যে তিনি সেটি বর্ণনা করেছেন।

এটিকে কোন কোন মুজতাহিদ হাদীস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ বলে বিবেচনা করেন। আবার কোন কোন মুজতাহিদ এটাকে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ বিবেচনা করেন না। এক্ষেত্রে যিনি এটিকে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ বিবেচনা করেন তার রায়টি অপর মুজতাহিদের কাছে হাদীসের পরিপন্থী বলে মনে হতে পারে।

ঙ- হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকে মুহাদ্দিস বিভিন্ন দেশকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন। যেমন হেজাজের অনেক মুহাদ্দিস বলেন, কোন বর্ণনাকারী যদি ইরাক

বা শামের অধিবাসী হয় তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল, তার বংশপরম্পরার মূল কেন্দ্র আরব হতে হবে, অথবা তার জীবনের জ্ঞানার্জনের অংশটা হেজাজে অতিক্রম হতে হবে। নতুবা তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। এমনকি কেউ কেউ তো একথাও বলেছেন যে, তাদের বর্ণিত হাদীসকে তোমরা আহলে কিতাবেদের মতই মনে করবে। সত্য বা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করবে না। কারণ হিসেবে তারা বলেন, হাদীসের কেন্দ্র থেকে যারা দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেছেন তাদের কাছে হাদীসের ভাষ্য যথাযথ পৌঁছা সম্ভবপর হয় না। তাই তাদের কাছে এমন অনেক হাদীস পরিলক্ষিত হয়েছে যা অন্য কারো কাছে পাওয়া যায় নি। আবার অনেক সময় তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো ইসলামের মৌলিক নীতির আলোকেও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচ্য হয়। তাই তাদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। ফলশ্রুতিতে যার কাছে এ ধরনের হাদীস গ্রহণযোগ্য তার কাছে অপর মুজতাহিদের রায়কে হাদীসপরিপন্থী মনে হতে পারে।

তবে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, এই কারণে কোন মুজতাহিদকে হাদীস তরক করেছেন বলে মন্তব্য করা বৈধ নয়।

চতুর্থ কারণ:

খবরে ওয়াহেদ তথা যেই হাদীসটি শুধুমাত্র বিশুদ্ধ একটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, অন্য সনদে তার বর্ণনা পাওয়া যায় না- এমন হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত আরোপিত হয়েছে তার মধ্যে মুজাতাহিদদের মাঝে বেশ মতভেদ রয়েছে।

কেউ বলেন, এই খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের রাসূলের মৌলিক নীতির পরিপন্থী না হতে হবে। আবার কেউ শর্ত করেছেন যে, যদি এই হাদীসটি মৌলিক নীতির পরিপন্থী হয় তাহলে উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ ফকীহ হতে হবে। আর কেউ শর্ত করেছেন যে, এসব বর্ণনা সেই ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য হবে যেসব বিষয় সচরাচর লোকদের থেকে প্রকাশ পেত না।

এ ধরনের মতভেদের কারণে অনেক মুজতাহিদ বিভিন্ন হাদীস অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে থাকেন। ফলে তার রায় অপর মুজতাহিদের কাছে হাদীস পরিপন্থী বলে পরিলক্ষিত হতে পারে, যিনি উক্ত হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন।

পঞ্চম কারণ:

অনেক সময় ঘটনা এমনও হয় যে, মুজতাহিদের কাছে হাদীস ঠিকই সংরক্ষিত ছিল কিন্তু তিনি তা ভুলে গেছেন। তাই এমতাবস্থায় তিনি যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেটা হাদীস পরিপন্থী বলে পরিলক্ষিত হতে পারে। এক্ষেত্রে বিধান হল, হাদীসে বর্ণিত বিষয়টাই প্রধান্য পাবে। স্বয়ং ওমর রাযি. থেকেই এমন দুটি ঘটনা বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ কারণ:

হাদীসের মধ্যে এমন কোন শব্দ বিদ্যমান থাকা যার অর্থের মধ্যে অস্পষ্টতা রয়েছে। এক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মাঝে এই শব্দের অর্থ নিয়ে বিভিন্ন কারণে মতপার্থক্য হয়ে

থাকে। যেমন, এলাকা ভেদে শব্দের অর্থে ভিন্নতা থাকা বা শব্দটি মানুষের মুখে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় অভিধানে তার ব্যতিক্রম অর্থ রয়েছে ইত্যাদি।

সপ্তম কারণ:

কোন হাদীস এক মুজতাহিদের কাছে এমন মনে হয় যে, কাঙ্ক্ষিত মাসআলাটির দলীল এই হাদীসে বিদ্যমান নয়। আবার এই হাদীস দিয়েই অন্য মুজতাহিদ উদ্দিষ্ট মাসআলাটির জন্য দলীল পেশ করে থাকেন।

মুজতাহিদদের প্রতিভার উপর ভিত্তি করেই এ ধরনের মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ষষ্ঠ কারণ থেকে এটির ভিন্নতা হল, ষষ্ঠ কারণে হাদীসের কোন শব্দের মধ্যে অস্পষ্টতা থাকার কারণে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়া আর সপ্তম কারণের মধ্যে শব্দগত দিক থেকে কোন অস্পষ্টতা নেই তবে দালালত তথা প্রমাণিক ধারাবাহিকতা নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়া।

অষ্টম কারণ:

কোন ক্ষেত্রে এমন দুটি বিপরীতমুখী দলীল উপস্থিত হওয়া যে প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। এক্ষেত্রে একটিকে গ্রহণ করলে অপরটিকে ছেড়ে দিতে হয়। যেমন কোন হাদীস ব্যাপক পরিধি সম্বলিত কোন বিষয় প্রমাণ করে ঠিক অন্য একটি হাদীস এই ব্যাপকতাকে অতিক্রম করে বিশেষ পরিধির জন্য বিশেষ বিধান প্রমাণ করে। এক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে যারা সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হয়েছেন তাদের কাছে কোন একটি অধ্যায় পরিত্যাগ করা হাদীস পরিত্যাগ করা বলে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। আসলে এই সমন্বয়সাধন সাধারণ কোন বিষয় নয়। এটি একটি সর্বোচ্চ প্রতিভার মহান সুফল। তাই এক্ষেত্রে মুজতাহিদদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়া ব্যতিক্রম কিছু নয়।

নবম কারণ:

শক্তিশালী দলীলের বিপরীত কোন মতামতকে প্রত্যাখ্যান করা। যেমন কোন একটি বিষয়ে উম্মাতের অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের একটি মত রয়েছে, সাথে তার বিপরীত অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরামের মতও রয়েছে। এক্ষেত্রে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতকে ইজমার অন্তর্ভূক্ত করে অন্য বড় বড় ব্যক্তিত্বদের মতকে প্রত্যাখ্যান করা -যেটির সাথে হাদীসেরও সমর্থন রয়েছে- হাদীস পরিত্যাগ বলে মনে করা। এর কারণ হচ্ছে কোন কোন সময় এলাকাভিত্তিক কোন মাসআলা প্রসিদ্ধি লাভ করে থাকে ফলে এর বিপরীত ওলামায়ে কেরামের যে মতটি বর্ণিত আছে সেটি তাদের হস্তগত না হওয়া। ফলে তিনি একথা বলে দিলেন যে, এব্যাপারে কোন ওলামায়ে কেরামের মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। তথা এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অথচ এর বিপরীতে বড় বড় ওলামায়ে কেরামের মত বিদ্যমান থাকায় তা সর্বসম্মত মতের রূপ নিতে পারে নি। ফলে যিনি এটিকে সর্বসম্মত মত মলে ব্যক্ত করেছেন তার মতটি উক্ত বড় বড় ওলামায়ে

কেরামের মতের বিপরীতে অবস্থান করে সর্বসম্মত বলে সিদ্ধান্ত দেওয়াকে নাকচ করে দিচ্ছে।

যেমন, কেউ বললেন, "গোলামরে সাক্ষ্য কেউ গ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই।" অথচ গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারে আলী রাযি., আনাস রাযি. এবং কাজী শুরাইহ রহ. থেকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত আছে।

অথবা কেউ বললেন, নামাযে রাসূল সা. এর উপর দরুদ পড়া কেউ ওয়াজিব বলেছেন বলে আমার জানা নেই। অথচ আবু জাফর আল বাকের রহ. থেকে ওয়াজিব বলে মতামত বর্ণিত আছে।

এক্ষেত্রে যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটা হল, যিনি ইজমার দাবী করেছেন আসলে সেটা ইজমা নয় এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতের বিপরীতে যে মতটি রয়েছে সেটিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে মনে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

দশম কারণ:

কোন হাদীসকে এমন কোন রায়ের সাথে তুলনা করা যার সাথে তুলনা করলে হাদীসটি কোন না কোন কারণে পরিত্যাজ্য হতে বাধ্য। কিন্তু তিনি যে তুলনা করেছেন তার এই তুলনার মধ্যেই ত্রুটি থেকে যাওয়া। যেমন অনেকে এই মত পোষণ করে থাকেন যে, যখন কোরআনের স্বাভাবিক ভাবধারার সাথে কোন হাদীসের বৈপরীত্ব হবে তখন সে হাদীস পরিত্যাজ্য হবে। এই মতামতের কারণে অনেক হাদীস তারা পরিত্যাগ করেছেন।

যেমন তারা সেই হাদীসকে পরিত্যাগ করেছেন, যে হাদীসে সাক্ষ্য ও কসমের সমন্বয়ে বিচার ফয়সালা করার কথা বর্ণিত আছে। এটি কোরআনের যে আয়াতে দুইজন সাক্ষীর কথা উল্লেখ আছে সে আয়াতের বাহ্যের বিপরীত বলে তারা মনে করেন। ফলে তারা এই হাদীসটিকে পরিত্যাগ করেছেন।

অথচ কোরআনের বাহ্যিক অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হলেই যে হাদীস পরিত্যাজ্য হবে এই নীতিটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য তার উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক।

আমরা এই দশটি কারণ এখানে উল্লেখ করলাম। এছাড়া আরো অনেক কারণ থাকতে পারে।

তবে কথা হচ্ছে ওলামায়ে কেরামদের হাদীস ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শত অজুহাত থাকতে পারে যার সবগুলো অজুহাত তারা পেশ করে যান নি। ফলে আমাদের কাছেও তার হাদীস পরিত্যাগ করার বিষয়টি অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে। আর যে হাদীসগুলো পরিত্যাগ করার কারণ তাদের থেকে বর্ণিত রয়েছে তার সবগুলো কারণও আমাদের হস্তগত হয় নি। যখন তাদের থেকে হাদীস পরিত্যাগ করার কোন কারণ আমাদের হস্তগত হয়েছে সেটা পরিত্যাগ করার কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু যে হাদীসটি পরিত্যাগ করার কারণ আমাদের কাছে পৌঁছে নি তার নির্দিষ্ট কোন কারণ থাকতেও পারে আর নাও থাকতে পারে, যেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই যে হাদীসটি পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত কোন কারণ বিদ্যমান আছে সেটা গ্রহণযোগ্য। আর যেটা পত্যিাগ করার ক্ষেত্রে

তেমন যুক্তিযুক্ত কোন কারণ পাওয়া যায় না তা আমরা "তার কাছে যুক্তিযুক্ত কোন কারণ অবশ্যই আছে" এই ধারনা করে হাদীস পরিত্যাগ করতে পারি না। কারণ, শরিয়াতের দলীল সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির রায়ের উপর ভিত্তি করে —যার স্পষ্ট কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না— হাদীস পরিত্যাগ করার জন্য আমরা শরিয়াতের পক্ষ থেকে নির্দেশিত নই। তারা যে মত দিয়েছেন সেটা একান্ত তাদের জন্য প্রযোজ্য। এর হিসাব আল্লাহর কাছে তারাই দিবেন। কিন্তু আমরা হাদীস পিরত্যাগ করে তাদের মত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অপারগ। কারণ, আমরা যদি তাদের মতের উপর ভিত্তি করে একের পর এক হাদীস পরিত্যাগ করতে থাকি তাহলে একসময় দেখা যাবে যে আমাদের কাছে শুধু ওলামায়ে কেরমাদের মতই রয়েছে। হাদীসের বৃহৎ অংশ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

তবে কথা হচ্ছে তাদের কাছে যেহেতু হাদীস পরিত্যাগ করার বিশেষ এবং গ্রহণযোগ্য কোন অজুহাত রয়েছে তাই কোন হাদীসে যদি কোন বিষয় হারাম করা হয় আর তারা সেটাকে হালাল বলেছেন এর উপর ভিত্তি করে তাদের উপর এই অপবাদ লাগানো কোন ক্রমেই বৈধ নয় যে, তারা হারামকে হালাল মনে করেছেন অথবা তারা আল্লাহর বিধান অমান্য করেছেন। অনুরূপ কোন হাদীসে যদি কোন কাজের উপর শাস্তি বা অভিশাপের কথা উল্লেখ থাকে তাহলে তার উপর এই অপবাদ চাপানো যাবে না যে, তিনি যেহেতু এই কাজটি করেছেন তাই তিনি এই আয়াতের অভিশাপ বা শাস্তির অন্তর্ভূক্ত হবেন।

কারণ, মুজতাহিদ যদি তার কোন ইজতেহাদে ভুল করে ফেলেন এর ফলে তার উপর কোন শাস্তি আরোপিত হয় না। বরং তিনি এর কারণেও সওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকেন। এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। শুধু মুতাযিলাদের বিশর মুরাইসী এবং তার কিছু অনুসারীরা বলেন যে, মুজতাহিদ যদি ভুল করেন তাহলে এর জন্য তিনি শাস্তির উপযুক্ত হবেন।

প্রকৃত পক্ষে এটা মোটেই ঠিক নয়। কারণ, কোন ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য তখনই হতে পারে যখন সে জেনেশুনে আল্লাহর কোন বিধানকে লঙ্ঘন করবে। কিন্তু সঠিক বিষয়টি জানার চেষ্টা করার পরেও যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সেটা তো তার সাধ্যের বাইরের বস্তু এবং তার জ্ঞান ও ইচ্ছাবহির্ভূত বস্তু। এতে আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দান করেন না।

উপরন্তু যিনি তার কাজটিকে শরীয়াতের কোন দলীলের আলোকে করেছেন তিনি শাস্তির যোগ্য হওয়ার কোন কারণই হতে পারে না, বরং এটি তার পুরস্কৃত হওয়ার কারণ বলেই বিবেচ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ . فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾

অর্থাৎ, এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীসমূহকে দাউদের অনুগত করে দিয়েছিলাম; তারা আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করত। এই সমস্ত আমিই করেছিলাম। সূরা আম্বিয়াঃ ৭৭-৭৮

এখানে আল্লাহ তাআলা সুলাইমান আ. কে সঠিক রায়প্রাপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু জ্ঞান সততার বিষয়টি উভয়ের উপরেই প্রযোজ্য করেছেন।

বুখারী ও মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, যখন কোন বিচারক বিচার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন ফলে তার বিচারটি সঠিক হয়েছে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। আর সাধ্যমত চেষ্টা করার পরেও যদি সে সঠিক বিচার করতে সক্ষম না হন তাহলে তার জন্য রয়েছে একগুণ প্রতিদান।

এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুজতাহিদ যদি ভুলও করেন তবুও তার ইজতেহাদের কারণে তার জন্য একগুণ সওয়াব থাকবে। আর তার থেকে যে ভুল প্রকাশিত হয়েছে সেটা ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কারণ, সকল কাজে সঠিক বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যেমন কঠিন তেমন অসম্ভবও। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন, দীনের মধ্যে আল্লাহ তোমাদের জন্য অসাধ্য কোন কিছু রাখেন নি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান। কঠিন করতে চান না।

বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, বনী কুরাইজার যুদ্ধের সময় সাহাবায়ে কেরামদেরকে রাসূল সা. বললেন, তোমাদের সকলেই বনী কুরাইজায় গিয়ে যেন আসরের নামায পড়ে। কিন্তু পথিমধ্যে আসরের সময় উপস্থিত হলে তখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। কেউ বললেন, না। আমরা বনী কুরাইজায় গিয়েই আসরের নামায আদায় করব। আর কেউ কেউ পথেই আসরের নামায আদায় করে নিলেন। কিন্তু রাসূল সা. তাদের কাউকেই কোন তিরষ্কার করলেন না।

প্রথম মতানুসারীরা রাসূল সা. এর নির্দেশকে তার বাহ্যের উপর প্রযোজ্য করে অতিক্রান্ত সময়কেই তার আসল সময় বলে মনে করেছেন। আর অপর দল বিভিন্ন দলীলের ভিত্তিতে মনে করলেন যে, রাসূল সা. এর নির্দেশের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কাজা হয়ে যায় যাক কিন্তু পথিমধ্যে নামায পড়া যাবে না। বরং এর উদ্দেশ্য হল, তোমরা অতি দ্রুত বনী কুরাইজায় গিয়ে উপস্থিত হয়ে যাবে, যেন আসরের নামাযটা বনী কুরাইজায় গিয়ে আদায় করতে পারো।

আর এই হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ওলামায়ে কেরামদের মাঝে মতভেদ তুঙ্গে উঠেছে। কোন সাধারণ রীতির বাহক দলীলকে বিশেষ কোন দলীলের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা

যায় কি যায় না। অথচ তারা সকলেই একথা বলেন যে, যারা রাস্তায় নামায পড়েছে তাদের নীতিটাই বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল।

তাছাড়া কারো যদি কোন ক্ষেত্রে ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ হবে বলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য যেসব বিষয় বাধার কারণ হতে পারে সেগুলোর অনুপস্থিতিও আবশ্যক। যেমন- কেউ কোন অপরাধ করল কিন্তু পরবর্তীতে সে যদি তাওবা করে, আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমন কোন ভাল কাজ করে যার কারণে পাপ মোচন হয়, দুনিয়ার কোন আযাবে গ্রেপ্তার হয় বা অন্য কোন কারণ উপস্থিত হয় তাহলে একথা বলা যাবে না যে, সে এই ভুলের কারণে এই শাস্তির যোগ্য। এসব বাধার কারণ অনুপস্থিত বলে নিশ্চিত হতে পারলে তবেই বলা যাবে যে, অমুক ব্যক্তি অমুক ভুলের কারণে এই শাস্তির উপযুক্ত।

বিষয়টা ব্যাখ্যা করলে ফলাফল দাড়ায় যে, অমুক কর্মের ফলে অমুক শাস্তি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। তবে অমুক ব্যক্তি যে বাস্তবেই অপরাধে অপরাধি এবং এর থেকে সে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন পন্থা নেই; তবেই কেবল একথা বলা যেতে পারে যে অমুক ব্যক্তি অমুক অপরাধ করেছে ফলে সে অমুক শাস্তির উপযুক্ত।

একথার উদ্দেশ্য হল, কেউ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করলে তার উপর নিশ্চয় যে শাস্তি আরোপিত হওয়ার কথা তা আরোপিত হবে। তবে আগে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক যে, সে হাদীস তরক করেছে এবং এই অপরাধ থেকে তার পরিত্রাণের কোন উপায় নেই।

যারা কোন হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন তারা তিন ভাগে বিভক্ত

১- তার এই হাদীস তরক করা উম্মাতের সকলের ঐক্যমতে বৈধ। যেমন তার যে সময় জানার প্রয়োজন হয়েছে সে সময় সে উক্ত মাসআলা জানার জন্য তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টায় কোন ত্রুটি করে নি। কিন্তু তার শত চেষ্টার পরেও সে উক্ত বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় নি। এক্ষেত্রে হাদীসের উপর আমল না করার কারণে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ হবে না। এটা উম্মাতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত।

২- তার এই হাদীস তরক করা বৈধ নয়। আমরা কোন ইমামের ব্যাপারে এমন ধারনা করতে পারি না যে, তিনি এমনভাবে হাদীস তরক করেছেন যার ফলে তিনি একটি হারাম কাজে জড়িত হয়েছেন।

৩- তবে এমনটা হতে পারে যে, তার ইজতেহাদে যে ভুল হয়েছে সেটা তার চেষ্টার মধ্যে কোন ত্রুটির কারণে হয়েছে বা তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করার পূর্বেই এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যদিও এই মতের পক্ষে তার যথেষ্ট দলীলাদী রয়েছে। এটা তাদের পক্ষ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে হয় না। বরং তারা এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত দেওয়াকে ভয় করতেন। এমনকি তারা মনে করতেন যে, আমার এই ফতোয়ায় কিনা আবার কোন ভুল হয়ে যায় ফলে আমাকে আল্লাহ তাআলার শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। তারা সর্বদাই আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তাই তাদেরকে রাসূল সা. এর এই বাণীর আওতাধীন করে গুনাহগার বানানো মোটেও শোভা পাবে না। রাসূল সা. বলেন,

"বিচারকরা তিন ধরনের। দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামে প্রবেশ করবে আর এক ধরনের বিচারক জান্নাতে প্রবশ করবে। যে ধরনের বিচারকরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হলেন, যারা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করেছেন। আর যে দুই ধরনের বিচারক জাহান্নামে প্রবশে করবে তাদের একদল হল তারা, যারা অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকেই বিচার ফয়সালা করে। আর অপর দল হল তারা, যারা সত্য উপলব্ধি করেছে কিন্তু তারা সে অনুপাতে ফয়সালা করে নি।"

কেউ যদি এমনটা করেই থাকেন তাহলে সে বিষয়ে তো আমরা অবগত নই যে তিনি এমন করেছেন আর তিনি এই শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কোন বাধার কারণও বিদ্যমান রাখেন নি। তাহলে আমরা তার উপর শাস্তির বিষয়টি কিভাবে প্রয়োগ করতে পারি। বরং আমরা তাকে তার ইজতেহাদের কারণে মাযুর মনে করতে পারি। তবে তাই বলে আমরা তার মতামতকে অকপটে মেনে নিয়ে অন্ধ অনুকরণ করার প্রতি নির্দেশিত নই। আমাদের দায়িত্ব হল আমরা বিশুদ্ধ ভাবে বিষয়টি তালাশ করতে থাকব।

আমরা কোন বিষয় বিবেচনা করতে গেলে সেখানে একটি মৌলিক নীতি অবশ্যই সামনে রাখতে পারি। সেটা হল, যেসব হাদীস তরক করা হচ্ছে সেগুলো দুই ভাবে বিভক্ত।

ক- সেটি প্রমাণিত হতে এবং আমল করতে কোন ধরনের বাধা নেই। বরং তার সনদ ও মতনে কোন ধরনের অস্পষ্টতা বা মতভেদের কোন সুযোগ নেই।

খ- সেটি প্রমাণিত হতে সনদে, মতনে বা অন্য কোন সূত্রে মতভেদ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

প্রথম প্রকারের হাদীসে আমল করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। এটি নির্দিধায় আমল করতে হবে। এতে ওলামায়ে কেরামের কোন মতভেদ নেই।

ইমামদের থেকে যে বর্ণিত আছে, "যখন কোন হাদীস সহীহভাবে প্রমাণিত হবে তখন সেটাই হবে আমার মত" তা এসব হাদীসের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

খবরে ওয়াহেদের বিধান

খবরে ওয়াহেদ নিয়ে আলোচনা বাহ্যত একটি অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটা আলোচনার উদ্দেশ্য হল, আমাদের হস্তগত হাদীসের সবচেয়ে বেশি পরিমাণই হচ্ছে খবরে ওয়াহেদ এবং এর উপর ভিত্তি করে যেহেতু অনেক বিধান বাস্তবায়িত হয় তাই এই ব্যাপারে আমাদের কেমন ধারনা থাকা চাই এবং এক্ষেত্রে আমাদের নীতি কেমন হওয়া চাই এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যই এই আলোচনা। এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, ইমামগণ কেন বিভিন্ন হাদীস তরক করতে বাধ্য হয়েছেন।

খবরে ওয়াহেদ তথা কোন হাদসি যদি শুধুমাত্র একটি সনদে বর্ণিত থাকে তাহলে এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে।

বিষয়টি হল, খবরে ওয়াহেদ সাধারণত কোন বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন আনুসাঙ্গিকতার কারণে খবরে ওয়াহেদ শুধুমাত্র একক ব্যক্তির বর্ণনা হওয়া সত্ত্বেও সেটি একীনের স্তরে উন্নিত হয়। আবার অনেক সময় এমন হয় যে,

হাদীসের মধ্যে এমন কোন বিষয় বিদ্যমান রয়েছে যে, এটি অনেক সাহাবা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার পরেও সেটি কোন বিষয়কে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না। যেসব হাদীস অকাট্যভাবে কোন বিষয় প্রমাণ করে না সেগুলো আবার বিভিন্ন করণে অকাট্য প্রমাণিত হয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

সকল ফকীহের নিকট এবং কোন কোন মুতাকল্লিমের নিকট সেটি একীনের স্বতরে উন্নীত হয়:

যেমন কোন একটি হাদীস যদি বিষেশ কোন ব্যক্তিবর্গ থেকে বর্ণিত হয় —যেটাকে আসাহ্হুল আসানীদ বলা হয়— যাদের ব্যাপারে বর্ণনাকারীর কাছে উক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে পূর্ণ পরিচয় সংগৃহীত রয়েছে এবং বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক কারণও রয়েছে যেগুলোর কারণে তার কাছে হাদীসটি একীনের স্তরে উন্নীত হয়েছে; ঠিক এই হাদীসটিই যদি অন্য কারো কাছে বর্ণনাকারী ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা না থাকে বা উক্ত অনুসঙ্গগুলো উপস্থিত না থাকে তাহলে তার কাছে হাদীসটি একীনের স্তরে উন্নীত হতে পারে না।

এজন্য দেখা যায় অনেক ওলামায়ে কেরামের কাছে অনেক বিষয় একিনী বলে প্রমাণিত হলেও আবার অনেকের কাছে তা একীনের স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। ফলে তিনি হাদীসটি অন্য একটি একীনি হাদীসের বিপরীত মনে করে একটিকে প্রাধান্য না দিয়ে অপরটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

যেমন হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. একটি বিক্রয়কার্য করেছিলেন যেটি সাধারণ দৃষ্টিতে বৈধ বলে মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে সেটি ছিল একটি সুদী কারবার। কিন্তু যায়েদ রাযি. এর এ ব্যাপারে জানা ছিল না। আম্মাজান আয়েশা রাযি. এ ব্যাপারে অবগত ছিলেন। তিনি যখন যায়েদ রাযি. এর এই কারবারটির কথা শুনলেন তখন তিনি আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ীর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি তার কাছে এই সংবাদটি পৌঁছে দাও যে, যায়েদ যে কারবারটি করেছে তা থেকে তাকে তাওবা করতে হবে। নতুবা তার হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি সব নেক কাজ বিফল যাচ্ছে।

অনুরূপ তাদের মাঝে এ বিষয়টি নিয়েও বেশ মতভেদ পরিলক্ষিত হয় যে, হাদীসের ভাষ্যের বাহ্যিক অর্থটাই কি এই হাদীসের মৌলিক চাহিদা; না এই হাদীসের সূত্রপাতের পিছনে যে কারণটি রয়েছে সেই কারণটি এই হাদীসের মৌলিক চাহিদা। প্রথমটিকে বলা হয় যাহের আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় নস। এখন হাদীসের চাহিদা কোনটি, যাহের না নস। যদি যাহের হয় তাহেল হাদীসের স্বাভাবিক গতিবিধিটাই হল মূল। এক্ষেত্রে হাদীসে বর্ণিত বিধানের হেতু মূল লক্ষ্য নয়। অনেক ওলামায়ে কেরাম হাদীসের এই ধারাগতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।

অবার অপর মুজতাহিদের কাছে এই হাদীসের নস তথা হাদীসের ভাষ্যের উৎপত্তির হেতুটাই হাদীসের মৌলিক চাহিদা। ফলে তিনি এই হাদীস থেকে এমন কোন বিষয়ের প্রমাণ দেন যে, বাহ্যত হাদীসের মধ্যে তার স্পষ্ট বর্ণনা পরিস্ফুটিত হয় না। কিন্তু তার বিচক্ষণতা, হাদীসের এই ধারাগতি-ভিন্ন কোন অর্থের অনুকুলে ব্যাখ্যা করলে অন্য

হাদীসের সাথে বৈপরীত্বমূলক কোন বিষয়ের আগমণ ইত্যাদি বিষয় তার কাছে স্পষ্ট থাকার ফলে তিনি এই বাহ্যিক চাহিদাকে ত্যাগ করে হাদীসের মূল কারণের দিকে বেশী গুরুত্বারোপ করছেন। ফলে দেখা যায় যে, উভয় মুজতাহিদের দলীলের ক্ষেত্রে হাদীসও এক ভাষ্যও এক কিন্তু সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেক তফাৎ।

এখানে আরো একটি বিষয় প্রানিধানযোগ্য যে, যখন খবরে ওয়াহেদ শাস্তি বিষয়ক কোন কিছুর বর্ণনা দিবে তখন তার বিধান কি হবে?

এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। তবে সংক্ষিপ্ত কথা হল, কোন কোন ফুকাহায়ে কেরামের নিকট খবরে ওয়াহেদ যদি কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত হয় তাহলে এর উপর আমল করা ওয়াজিব। এই হাদীসের মধ্যে যেটাকে হারাম করা হয়েছে সেটাকে হারাম মনে করা ওয়াজিব। তবে সেটার মধ্যে যদি কোন ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ থাকে তাহলে সেটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হওয়া ব্যতীত তার শাস্তি বাস্তবায়ন করা যাবে না।

এর একটি দৃষ্টান্ত তারা এই পেশ করেছেন যে, হযরত আয়েশা রাযি. যে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. এর ব্যাপারে আবু ইসহাক আস-সুবাইয়ীর স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তুমি যায়েদকে বলবে যদি সে তাওবা না করে তাহলে তার হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি বাতিল হয়ে যাবে।

এই হাদীসের উপর আমল করার পদ্ধতি হল, আমরা হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার উপর আমল করতে গিয়ে বলব যে, আম্মাজান আয়েশা রাযি. যে কারবারটির ব্যাপারে এই ধমকি উল্লেখ করেছেন সে কারবারটি অবশ্যই হারাম বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু আমরা আয়েশা রাযি. এর এই হাদীসের উপর ভিত্তি করে হযরত যায়েদ রাযি. এর কারবারের কারণে তার হজ্জ, জিহাদ বাতিল হয়ে গেছে বলে বলতে পারব না। কারণ, এই হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি বাতিল হয়ে যাওয়া এটা একটা শাস্তি। তাই এটার উপর আমল করতে হলে অবশ্যই সেটি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হতে হবে। শুধু খবরে ওয়াহেদ হলেই হবে না। কিন্তু যেহেতু এই হাদীসে একটি বিষয়কে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে সেটা আমরা হারাম বলেই বিবেচনা করব।

অধিকাংশ ফুকাহা এবং ওলামায়ে সালাফদের রায় হল, হাদীসে বর্ণিত হারাম বা শাস্তি বিষয়গুলোকে যেমনভাবে বিশ্বাস করা আবশ্যক তেমনি এর বিধানও বাস্তবায়ন করাও আবশ্যক। কারণ, সাহাবায়ে কেরামসহ ওলামাদের সকলেই এ ধরনের হাদীস দিয়েই বিধান বাস্তবায়ন করতেন, যেমন সেটার উপর আমল করা তথা হারামকে হারাম মনে করা আবশ্যক। কারণ, এসব হাদীসে নিষেধাজ্ঞার উপর আমল করা যেমন একটি আমল ঠিক এর বিধান বাস্তবায়ন করাও একটি আমল।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, যেহেতু খবরে ওয়াহেদে বর্ণিত বিষয়গুলো একীনি নয় তাই কোন শাস্তি বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এই খবরে ওয়াহেদের উপর ভিত্তি করে কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে? কোন শাস্তির ব্যাপারে অকাট্য দলীল না থাকাটাই তো সে ব্যাপারে দীলল না থাকার নামান্তর। তাহলে খবরে ওয়াহেদে যে শাস্তির কথা বর্ণিত

হয়েছে সেটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত না হওয়ার কারণে সেটি কার্যকারিতা শুন্য বলে গণ্য হবে। যেমন কোরআনের যে আয়াতগুলো মুসহাফে নেই। তথা এগুলো কোরআনের আয়াত হওয়া সত্ত্বেও কোরআনে তা বিদ্যমান নেই। কারণ, এটা যদিও কোরআনের আয়াত কিন্তু খবরে ওয়াহেদের ভিত্তিতে এটি বর্ণিত হওয়ার কারণে এটিকে কোরআনের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয় নি।

এর উত্তর হবে এখানে দুইটি বিষয়, একটি হল কোন বিষয় প্রমাণিত করতে গেলে অবশ্যই তার জন্য দলীলের প্রয়োজন রয়েছে। যখন আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে পারব যে এর কোন দলীল নেই তাহলে আমরা নির্দিধায় বলতে পরব যে, এটা ভিত্তিহীন।

আরেকটি হল, যে হাদীসে শাস্তির কোন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর বিধান প্রমাণিত হওয়ার জন্য যেমন অকাট্যভাবে দলীল জরুরী নয় তেমনি সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্যও তেমন অকাট্য দলীল আবশ্যক নয়। তবে এটা অবশ্যই প্রমাণিত হতে হবে যে, যিনি এই নিষিদ্ধ কর্মে জড়িয়ে পড়েছেন তার উপর বর্ণিত শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বাধার কারণ হতে পারে সেগুলো অনুপস্থিত। তাহলে তার উপর এই খবরে ওয়াহেদের বিধানসম্বলিত দলীলের মাধ্যমেই শাস্তি প্রয়োগ করা যাবে।

এর কিছু দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে অতিক্রম হয়েছে। তাই যাদের থেকে এমন কোন বিষয় প্রকাশ পাবে যার উপর নিষেধাজ্ঞার বিধান আরোপিত হয় কিন্তু তার কাছে উক্ত কাজটি করার যুক্তিযুক্ত শরিয়াত অনুমোদিত কারণ বিদ্যমান রয়েছে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু এর মূল বিধান কোন কারণবশতঃ কারো উপর বাস্তবায়িত না হলে একথা বলা যাবে না যে, এটি যেহেতু খবরে ওয়াহেদ তাই এসব ক্ষেত্রে তাদের উপর যেমন শাস্তি বাস্তবায়িত হয় নি তেমনি অন্য কোন ব্যক্তি যদি এ ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে তার উপরেও এই শাস্তি বাস্তবায়িত হবে না।

এই মৌলিক নীতিটি সেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে যেসব ক্ষেত্রে একই বিষয়ে বৈধ-অবৈধ উভয় ধরনের হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। ফলে সে কোন একটি দিক বেছে নেওয়ার ফলে অপরটি ছেড়ে দিয়ে শাস্তির যোগ্য হয়েছেন বলে পরিদৃষ্ট হবে।

বিধানটি এভাবে প্রযোজ্য হওয়ার বিশেষ একটি কারণ হল, এধরনের বৈপরীত্বমূলক কর্মের বিবেচনায় ওলামায়ে কেরামদের দুইটি মত রয়েছে।

১। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এবং ফকীহগণের মতে আল্লাহ তাআলা প্রতেকটি বিষয়ে বিধান একটিই দিয়েছেন। কেউ ইজতেহাদ করে সঠিক পথ বেছে নিতে সক্ষম হয়েছেন আর কেউ তা পারেন নি। এক্ষেত্রে যিনি সঠিক বিধানটি বেছেনিতে সক্ষম হতে পারেন নি তিনি কোন শাস্তির মুখোমুখী হবেন না। কারণ, তিনি যদিও এক্ষেত্রে একটি ভুল পথ বেছে নিয়েছেন কিন্তু তিনি সত্য অন্বেষণের চেষ্টা করার পরেই সেটা নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তার চেষ্টা ও নিয়তের ফলে তিনি শাস্তি থেকে তো নিস্তার পাবেনই; উপরন্তু তিনি আল্লাহর কাছে একগুণ সওয়াবেরও অধিকারী হবেন।

২। অন্য কতিপয় ওলামায়ে কেরাম বলেন, তিনি যে সঠিক পথটি বেছে নিতে পারেন নি সেটা তার কাছে বেঠিক নয়। বরং তার জন্য সেটাই সঠিক। পক্ষান্তরে অপর কেউ যদি সেটাকে বৈধ নয় বলে বিশ্বাস করেন সেটা তার জন্যই প্রযোজ্য হবে। অন্য কারো উপর তার প্রভাব বিস্তার করবে না।

প্রশ্ন হতে পারে যে, উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটা বুঝতে পারি যে, মুজতাহিদগণ কোন বিষয়ে হালাল বা হারাম বলে কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে কোন না কোন একটি অশুভ দিক তাকে ঘিরে ধরে। তাই এক্ষেত্রে যদি এমনটা করা হত যে, যেসব হাদীসে কোন বিষয় হারাম হওয়ার বর্ণনা আছে বা কোন শাস্তির বর্ণনা আছে সেসব বিষয় তখনই কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য হবে যখন সকল ওলামাগণ কোন একটি মতের উপর স্থির করবেন। যদি কোন ক্ষেত্রে তাদের মতের স্থিরতা বা ঐক্যমত পাওয়া না যায় তাহলে সেটা আর আমলযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্যতার স্থান দখল করতে পারবে না। যাতে মুজতাহিদগণ এবং তাদের অনুসারী মুকাল্লিদগণ গুনাহে পতিত হওয়া এবং শাস্তির মুখোমুখী হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে।

এর উত্তর অনেক ভাবেই হতে পারে। তবে মূল কথা হচ্ছে, যদি উল্লিখিত দাবী বাস্তবায়ন করা হত তাহলে দেখা যেত শাস্তি এবং নিষেধাজ্ঞা শুধু সেসব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে যেসব ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামদের কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে সেখানে যেহেতু নিষেধাজ্ঞার কোন দলীল নেই তাই সেটা হালাল বলে গণ্য হবে। কারণ, প্রতিটি বস্তুর প্রাথমিক অবস্থাটা বৈধ এবং হালাল। অথচ এই দাবী ওলামায়ে কেরামের সকলের ঐক্যমতে প্রত্যাখ্যাত।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি কোন ইজতেহাদী মাসআলায় হালাল বিষয়কে হারাম জ্ঞান করে বা হারাম বিষয়কে হালাল জ্ঞান করে তাহলে এই বিপরীত ধারনার ফলাফল কার উপর বর্তাবে? অথচ আমরা জানি যে, ‘মুজতাহিদ তার ইজতেহাদের কারণে মুক্তিপ্রাপ্ত হবেন এবং মুকাল্লিদ যেহেতু তার অনুকরণে পথ মারিয়েছেন তাই তার উপরেও শাস্তি বর্তাবে না।’ তাহলে কাউকে গুনাহগার বানানো এবং তার থেকে পরিত্রাণ দেওয়া- এই কৃত্রিমতার কি অর্থ থাকতে পারে?

এর উত্তরে আমরা বলব, আসলে গুনাহের কাজ কেউ করুক এটা তো আমরা চাই না এবং ইসলামও সেটাকে সমর্থন করে না। কিন্তু কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি এ ধরনের কোন অপরাধের কারণ বিদ্যমান থাকে এবং তা থেকে পরিত্রাণের কোন উপায় না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে সে শাস্তির যোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে আমাদের তো এই অধিকার নেই যে, কোন গুনাহগার ব্যক্তিকেও আমরা নিষ্পাপ বলে সাফাই করব।

মোট কথা হল, কোন মুজতাহিদ এবং তার মুকাল্লিদ এই দুটি পদ্ধতির কোন একটিকে অতিক্রম করবে না।

১- যদি ধরেই নেই যে, তারা গুনাহে পতিত হওয়ার কাজ করেছেন। কিন্তু এর ফলে তাদের উপর কোন শাস্তি আরোপিত হবে না। বরং গুনাহ হবে কিনা তা নিয়েই যথেষ্ট সন্দিহান।

২- অথবা তারা যে কাজটিকে হালাল ভেবেছেন সেটা তাদের কাছে হালাল বলে বিবেচিত হবে। যদিও স্বয়ং সেই কাজটি অপর মুজতাহিদের কাছে এবং তার অনুসারীদের কাছে হারাম বলে বিবেচিত হচ্ছে। যারা হালাল ভাবছে তারা সেটাকে কোন না কোন যুক্তিযুক্ত দলীলের আলোকেই হালাল ভাবছে। আর যারা উক্ত কাজটিকেই হারাম ভাবছে আর তা থেকে বিরত থাকছে তাদের কাছেও যুক্তিযুক্ত দলীল আছে বলেই তারা সেটিকে হারাম বলে বিবেচনা করছে। কিন্তু এক মুজতাহিদের দলীল অপর মুজতাহিদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করছে না।

এই পথটাই আমাদের জন্য ওলামায়ে কেরামের ইজতেহাদ ও মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে অনুসরন করতে হবে। এ ছাড়া বিকল্প কোন বৈধ পথ নেই। যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা হবে অবৈধ পথ ও পন্থা। যেমন বলে দেওয়া যে, সকলেই গুনাহের অংশিদার হবে। মুজতাহিদও আর তার মুকাল্লিদও। অথবা এটা বলবে যে, “যদি এসব হাদীসের উপর আমল করা হয় তাহলে অন্য যারা এর উপর আমল করছে না তাদের উপর এই অপবাদ আরোপ করা হবে যে, তারা এইসব হাদীসগুলো ছেড়ে দিয়েছে আর আমরা তার উপর আমল করছি। ফলে তারা গুনাহগার হচ্ছে। আমরা তাদেরকে গুনাহগার বানাতে চাচ্ছি না। ফলে তাদের ইজতেহাদের সাথে আমরাও একমত হয়ে সকলেই এক যোগে হাদীসের উপর আমল তরক করে দিলাম। যাতে সকলের আমল একই ধরনের হয়ে যায়।” এই ধরনের চিন্তাচেতনা ও মনভাব পোষণ করা ভ্রষ্টতা বৈ কিছু নয়।

পরিশিষ্ট

(এই পরিশিষ্টটি অনুবাদকের পক্ষ থেকে সংযোজিত)

পরিশিষ্টে আমরা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

১- মতভেদের সূত্রপাত ইমামদের থেকে ঘটলেও তারা একে অপরকে ঘৃণা করা তো দূরের কথা বরং তারা পরস্পরকে এমন শ্রদ্ধা করতেন যে তার দৃষ্টান্ত অনেক বিরল। কিন্তু আমাদের বর্তমান কালে মতভেদটা এমন এক অশুভ পরিস্থিতি ধারণ করেছে যে, একে অপরকে কটুক্তি তো করছেই বরং অনেকে কাফের বলতেও দ্বিধা করছে না। অথচ তাদের এই মতভেদের সব সূত্র ও মাসআলা কোরআন-সুন্নাহ সমর্থিত। কেউ হয়ত একটি সুন্নাহর উপর আমল করছেন আর কেউ অন্যটির উপর। তবুও এই আমলের ভিন্নতা শরীয়ত-নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু পরস্পর পরস্পরকে যে তিরষ্কার ও অশোভনীয় আচরণ করে যাচ্ছে এটা পূর্ণ শরীয়াত-পরিপন্থি। হারাম ও গুনাহের কাজ। কিন্তু আমরা যখন পরস্পরে মতভেদ করি তখন আমরা মনে করি আমি যে রায়টি বেছে নিয়েছি সেটা শতভাগ ঠিক আর যিনি আমার মতের বিপরীতে অবস্থান করছেন তার মতামতটি শতভাগ ভুল। ভাবখানা এমন হয় যে, আমার মতটা শরিয়ত সম্মত আর তার মতটা শরিয়াত বিরোধী এবং তিনি উক্ত মত অবলম্বনের কারণে কোরআন সুন্নাহর বিপরীত করে গুনাগার হচ্ছেন। তাই আমি তার বিপক্ষে এমন কঠোর প্রতিবাদের স্থানে দাড়িয়েছি যেমন করে প্রদিবাদ করা হয় কোন মুনকিরে হাদীস তথা কোন ব্যাখ্যার আশ্রয় না নিয়ে হাদীস অস্বীকারকারীর বিপরীতে। অথচ মতভেদের বিষয়টি যদি ইসলামের মৌলিক চাহিদার সাথে তুলনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, এ ধরনের মতভেদ ইসলামে শুধু অনুমোদিতই নয় বরং ইসলামের চাহিদাও। হাদীসে বর্ণিত আছে,

اختلاف أمتي رحمة

'আমার উম্মাতের ইখতেলাফ হচ্ছে রহমতস্বরূপ।' -কাশফুল খাফা': ১ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৫৩

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা রফী উসমানী দা: বা: সুন্দর একটি উপমা পেশ করেছেন। তিনি বলেন,

আজকাল ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্য নিয়ে অনেক কাঁদা ছোঁড়া ছোঁড়ি হয়– ইসলাম তো একটাই। তাইলে এই হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এত মাজহাব কিসের জন্য? নিঃসন্দেহে ইসলাম একটা, আল্লাহ এক, কুরআন এক, কিবলা এক, নবী এক। কিন্তু এই একটি দ্বীনের মাঝে আল্লাহ তাআলা এই দোদুল্যমানতা রেখেছেন যে, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে কয়েক রকম আমলের সম্ভাবনা রয়েছে। যাতে করে প্রত্যেক যামানার ফকীহগণ কুরআন ও সুন্নাহর উপর গবেষণা করে সমসাময়ীক মাসআলার সামাধান বের করতে পারেন। আর এই গবেষণার ক্ষেত্রে ফকীহগণের মতে ভিন্নতা হওয়া স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এই মতবিরোধ বা ইখতেলাফ তারাই করতে পারবেন যাদের ইজতেহাদের (কুরআন সুন্নাহ থেকে গবেষণা করে সমস্যার সমাধান বের করার) যোগ্যতা আছে।

কুরআন সুন্নাহর উপর পারদর্শী এবং বিভিন্ন মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল হাদীস তার জানা আছে। যখন এমন বিজ্ঞ ফকীহগণ যখন কোন মাসআলায় ইখতেলাফ করেন উম্মতের জন্য তখন সেটা রহমত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ: কোন একটা মাসআলার সাথে সংস্লিষ্ট ফকীহগণের মাঝে দুই ধরণের রায় আছে। আর প্রত্যেকের কাছে তাদের নিজস্ব দালায়েল বিদ্যমান। তবে দালায়েলে কতয়ী' (সরাসরি কুরআন সান্নাহর নুসুস) কারো কাছে নেই। স্বাভাবিকভাবে সকলেই এক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্ধে পড়বে। সমকালিন মুফতিগণের জন্য অবকাশ আছে যে, তারা অন্য মাজহাবের ফকীহ -এর রায়ের উপর ফতাওয়া দিবে। তদ্রূপ অন্য কোন দেশে যদি এই ফতওয়ার বিপরিত কোন ফতওয়া গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সেখানকার মুফতীগণের জন্য নিজেদের মাজহাবের ইমামগণের রায় ছেড়ে অন্য মাজহাবের রায় গ্রহণ করা জায়েজ আছে।[১] অর্থাৎ, এক দেশে এক রায়ের উপর ফতওয়া অন্য দেশে অন্য রায়ের উপর ফতওয়া। এভাবেই শরিয়াতে দোদুল্যমানতার সৃষ্টি। আর এটা উম্মাতের জন্য একটা রহমত স্বরূপ।[২] ফকীহগণের মাঝে "اختلاف" তথা মতের পার্থক্য "تفرق" তথা সম্পর্কচ্ছেদ নয়। সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও মতবিরোধ হয়েছে, সম্পর্কচ্ছেদ বা লড়াই ঝগড়া হয় নি। দলাদলি হয় নি। মতপার্থক্য সত্ত্বেও ইমামাগণ একে অপরকে সম্মান করতেন। তাদের অনুসারী মুফতীয়ানে কেরামগণ আজও নিজেদের মাঝে ইখতেলাফ সত্ত্বেও পরষ্পরকে সম্মান করেন।

২- মনে রাখা চাই যে মতভেদের অর্থ এই নয় যে পরষ্পরে দ্বন্ধ-কলহে লিপ্ত হবে। বরং একে অপরকে আপন মতের সাথে একতা হলে যেমন করে ভালবাসতো মতপর্তক্যের পরে তার চেয়ে আরো বেশি ভালবাসা বিরাজ করা চাই। যাতে এই মতভেদের সূত্র ধরে পরষ্পরকে শয়তান কোন ধোকায় ফেলতে না পারে এবং উভয়ের মাঝে সম্পর্কচ্ছেদের সূত্রপাত না ঘটে। কারণ এই মতপার্থক্য নিয়ে আমরা যতই একে অপরের বিপরীতে অবস্থান করি না কেন; কিন্তু সেটা কোন গুনাহের কাজ নয়। পক্ষান্তরে পরষ্পরে সম্পর্কচ্ছেদ করা এটা একটা কবীরা গুনাহ। যা তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের মাঝে এর অপূর্ব দৃষ্টান্ত অনুভব করি। ইমামগণ তো বটেই জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও পরহেজগার ব্যক্তিবর্গ একে অপরকে মতভেদ ও ফতোয়ার ভিন্নতার কারণে সর্ম্পকচ্ছেদ করেছেন বলে এমন কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় নেই। তথা তাদের মতভেদে ও মতপার্থক্যের পরিধি ছিল নির্দিষ্ট একটা পরিধিতে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তাদের উপর উক্ত মতভেদ কোন প্রভাব বিস্তার করত না। ফলে দেখা যেত তারা মতভেদের পূর্বেও একে অপরের সাথে যেমন সদ্ব্যবহার করতেন ঠিক মতভেদের পরেও তাদের সেই সদ্ব্যবহারে কোন চিড় ধরে নি।

৩- মজহাবের ভিন্নতা মানে দীনের ভিন্নতা নয়। আমাদের এই বর্তমান যুগে দেখা যায় যে আমরা যেখানেই আমার মতের ভিন্নতা দেখতে পাই সেখানেই মনে করা হয় যে তারা

---

[১] অন্য মাজহাবের কোন একটা রায় আংশিক গ্রহণ করা বৈধ নয়। তাদের শর্তশারায়েত সহ গ্রহণ করতে হবে। - অনুবাদক

[২] কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া, পরিস্থিতি-পরিবেশ এক হয় না। এমতাবস্থায় যদি একই রায়ের উপর ফতওয়া আসে তাহলে কারো জন্য একেবারে সহজ হয়ে যাবে আর কারো জন্যে একদমই কঠিন। -অনুবাদক

দীনের উপর নেই। বরং তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। ইসলামের সাথে বৈপরীত্ব করে চলছে। এমনকি একথাও বলা হয় যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরষ্পর বিচ্ছিন্নতাকে হারাম করেছেন। আল্লাহর রাসূল সা. বলেছেন আমার উম্মাতের মধ্যে ফেরকাবন্দী হবে। বনী-ইসরাইলরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল আর আমার উম্মাত বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে। এই যে চার মাজহাবের ভিন্নতা এটাও এই হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভূক্ত। এই মতভেদ জায়েয নেই ইত্যাদি।

আসলে আমাদের কাছে জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আমরা অনেক বিষয়ের মাঝে ভিন্নতা থাকার পরেও একটিকে অপরটির মাঝে এমন ঘোল পাকিয়ে ফেলি যে, ভয় হয় যে আল্লাহ আমাদেরকে কিনা আবার এই চিন্তা-চেতনার কারণে আযাবে গ্রেপ্তার করেন।

প্রথমেই আমাদের জানা থাকা চাই যে, মতভেদের ক্ষেত্র তিনটি।

ক- যে ক্ষেত্রে কোন মতভেদের সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে মতভেদ করার অর্থই হল দীন ত্যাগ। যেমন মতভেদ হয়েছে ইসলাম ও কুফরের মাঝে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই মতভেদকে ধ্বংসের কারণ বলে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'অতঃপর তাদের মধ্যে দলগুলো পৃথক পৃথক পথ অবলম্বন করল। সুতরাং মহাদিবস আগমনকালে কাফেরদের জন্য ধ্বংস। সেদিন তারা কি চমৎকার শুনবে এবং দেখবে, যেদিন তারা আমার কাছে আগমন করবে। কিন্তু আজ জালেমরা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' -সূরা মরিয়াম: ৩৭-৩৮

মোট কথা এ ধরনের মতভেদ মানেই ধর্ম নিয়ে মতভেদ করা। ধর্ম তো একটাই। আর তা হল ইসলাম। তাই কেউ যদি ধর্ম নিয়ে মতভেদ করে তাহলে তার এই মতভেদ তাকে দীন থেকে বের করে দিবে এবং সে কাফের-মুশরিক হয়ে মরবে। এর একটি সরল দৃষ্টান্ত এভাবে দেওয়া যায় যে, আমাদের বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে তাগুত ও তাদের তাদের দাসত্বের শিকলে আবদ্ধ শয়তানদের আর মুজাহিদদের মাঝে এই মতভেদ রয়েছে যে, তারা মনে কের যে, তারা যে আল্লাহর দেওয়া আইন ব্যতীত ভিন্ন কোন আইনে ফয়সালা করছে সেটা তাদের জন্য বৈধ। কারণ, তাদের কাছে ইসলাম মানে শান্তি। তারা তাদের খেয়াল খুশি মত যা কিছুই করুক না কেন তাদের সাথে মুসলামানরা কোন ক্রমে সংঘর্ষে অবতরণ করতে পারবে না। তাহলে মুসলমানদের ধর্ম আর ইসলাম তথা শান্তির ধর্ম থাকল না। যারা এই কাফেরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরল তারা মুসলিম নয় বরং সন্ত্রাসী। এসব তাগুতদের চেলাচামুণ্ডাদের মুখে এই বুলী আওরাতে শুনা যায় যে, আমরা মুসলিম; নো টেররিস্ট।

যারা ইসলাম সম্পর্কে এই ধরনের ব্যাখ্যা দেয় তারা আর কাদিয়ানী নামক যিন্দীকদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতরণকরাই হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ ইবাদত।

খ- ইসলামের মৌলিক এমন কিছু বিষয়ে মতভেদ করা যেগুলো অকাট্য তবে জরুরী তথা দিবালোকের ন্যায় সকলের কাছে স্পষ্ট বিষয় নয়। এ ধরনের মতভেদ মূলত কুফরীরই

একটি প্রকার। যদি কেউ এই ধরনের মতভেদের ভিত্তি কোন দলীলের উপর ভর করে করে থাকে তাহলে তার এই মতভেদের ফলে সে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং ভ্রষ্ট ফিরকার অর্ন্তভূক্ত হবে। আল্লাহর রাসূল সা. যে বনী ইসরাইলের মতভেদের সাথে উম্মাতে মুহাম্মাদীর মতভেদকে তুলনা করে একটিমাত্র দলকে জান্নাতী আর অন্য সকলকে জাহান্নামী ঘোষণা করেছেন তার ক্ষেত্রটাই হল এটা। এক্ষেত্রে যারা মতভেদ করবে তারা কাফের হয়ে যাবে না তবে তারা ভুলের পথে অবশ্যই পা দিয়েছে। এ ধরনের মতভেদ জায়েজ নেই। হারাম। মুসলমানদের পরষ্পরে যে মতভেদকে হারাম করা হয়েছে সেটা এই মতভেদই।

গ- ইসলামের ফুরুঈ তথা আমলগত-শাখাগত বিষয়ে মতভেদ করা। এধরনের মতভেদ যদি যোগ্য ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে নিসৃত হয় তাহলে এ ধরনের মতভেদ হারাম তো দূরের কথা বরং এই মতভেদ করার পর যদি ভুলও হয়ে যায় তবুও সে একগুণ সওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি সঠিক পথটা অবলম্বন করতে পারে তাহলে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ সওয়াব। রাসূল সা. যে বলেছেন, "যখন কোন বিচারক বিচার করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন ফলে তার বিচারটি সঠিক হয়েছে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান। আর সাধ্যমত চেষ্টা করার পরেও যদি সে সঠিক বিচার করতে সক্ষম না হন তাহলে তার জন্য রয়েছে একগুণ প্রতিদান।" এই সুসংবাদের ক্ষেত্রটাই হল এটা।

কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে আমরা মতভেদ করি এক ক্ষেত্রে আর তার উপর বিধান প্রযোজ্য করি আরেক ধরনের মতভেদের। ফলে আমাদের ইখতেলাফগুলো রহমাতের পরিবর্তে আযাবে রূপান্তর হয়ে যায়। আজ আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে যে হারে দলাদলী রয়েছে তার অধিকাংশ দলাদলীর কারণ এই ফুরুঈ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু পরষ্পরের আচরণটা পরিলক্ষিত হয় শত্রুদের সাথে বৈরি আচরণের মত। ফলে দেখা যায় যে, আমাদের এই বিচ্ছিন্নতার সূত্র ধরে তাগুত কাফেররা তাদের শত্রুতার জের প্রয়োগের জন্য খোলা ময়দানটা দখল করে নিতে কোন বাধার সম্মুখীন হয় না।

সবচেয়ে বেশি পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, যখন কোন কোন ক্ষেত্রে মুজাহিদদের মাঝেই এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আমি যেমন করে আল্লাহর রাস্তায় দীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দীনকে বুলন্দ করার জন্য অস্ত্র হাতে ধরেছি। ঠিক তেমনিভাবেই তো অপর মুজাহিদ দীনের বুলন্দির জন্য সব কিছু কোরবান করে অস্ত্র ধরেছে। হয়ত সে আমার দলের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাই বলে একে অপরকে মুরতাদ বা এর চেয়েও নিকৃষ্ট কোন শব্দ প্রয়োগের কী অর্থ হতে পারে। শুধু এতটুকুই না, তাদের ইবাদতের স্থানগুলোকে মন্দিরের সাথে তুলনা করে বোমাহামলা পর্যন্ত করা হচ্ছে। এটা তো কোন মতভেদ নয়; এটা আল্লাহর আযাবকে টেনে আনে। পরষ্পর পরষ্পরে মতভেদ থাকতেই পারে তাই বলে এতটা জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হওয়ার প্রমাণ তো কেউ দিতে পারবে না। যারা এ ধরনের অপবাদ দিয়ে থাকে তালাশ করলে দেখা যায় যে তারা যেসব ধারনার বশবর্তী হয়ে এত জঘন্য শব্দ উচ্চারণ করছে তার সূত্রটাই একেবারে মাকড়ের জালের মত দুর্বল এবং সবগুলো কুধারণার অন্তর্ভূক্ত। তাই কোন্ বিষয়ে আমাদের মতভেদ হচ্ছে সেটা আগে নির্ধারণ করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমাদে পরষ্পরের সাথে মোআমালা হতে

হবে। ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেছেন, কাউকে শাস্তি দিয়ে ভুল করার চেয়ে শাস্তি না দিয়ে ভুল করা উত্তম। ঠিক আমাদেরকেও এই নীতি অবলম্বন করা চাই।

৪- ইমাগণের প্রতিভার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করা হচ্ছে।

ইমায যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা কিতাবে বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. হাদীস অন্বেষণে বেশ শ্রম ব্যয় করেছেন। এর জন্য তিনি বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেছেন। আর ফিকাহ, সুক্ষ্ম বিবেচনা এবং ফিকহের মূল বিষয়ের অন্বেষণে তার কোন জুড়ি নেই। মানুষের সকলেই এ বিষয়ে তার পারিবারিত্বের অন্তর্ভূক্ত।

তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, ইমাম আবু হানীফা রহ. একবার স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি রাসূল সা. এর কবর মোবারক খুরে যাচ্ছেন। তখন তিনি বসরা এসে এক বক্তিকে ইবনে সিরীন রহ. কাছে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে বললেন। তিনি স্বপ্নের কথা ইবনে সিরীন রহ. এর কাছে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন যে, যে ব্যক্তি এই স্বপ্ন দেখেছে সে আল্লাহর রাসূল সা. এর হাদীস অন্বেষণে খুব ব্রতী হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনুল মোবারক রহ. বলেন, আল্লাহ যদি আবু হানীফা এবং সুফিয়ান সাওরী রহ. এর দ্বারা আমাকে অনুগ্রহ না করতেন তাহলে আমার মাঝে আর অন্য সাধারণ মানুষের মাঝে কোন পার্থক্য থাকত না।

ইমাম মালেক রহ. এর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, তাবেঈদের পরে ইমাম মালেক রহ. এর মত বড় ব্যক্তিত্ব আর কেউ ছিলেন না। সাহাবাদের পরে যেমন সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং ফুকাহায়ে সাবআ' ছিলেন ঠিক তেমনিভাবে তাদের ইন্তেকালের পরে ইমাম মালেক রহ. তাদের মত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইলেম অন্বেষণের জন্য মানুষ ছুটে আসত।

ইমাম শাফেঈ রহ এর ব্যাপারে ইমাম যাহাবী রহ. বর্ণনা করেন, একদিন ইমাম শাফেঈ রহ. আমর ইবনে সাওয়াদ রহ. কে বললেন, আমার দুইটি বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল। তিরন্দাজী এবং ইলেম অন্বেষণ। আমি তীরন্দাজীতে এতটাই পরদর্শী অর্জন করেছি যে, আমি যে কোন সময় দশজনের সাথে একাই মোকাবেলার জন্য যথষ্টে। আমর ইবনে সাওয়াদ বলেন, তিনি তার ইলেমের ব্যাপারে কিছু বললেন না। আমি বললাম, আপনি অবশ্যই ইলমের ময়দানে তীরন্দাজীর চেয়ে অনেকগুণ বেশি পারদর্শী।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর ব্যাপারে যাহাবী রহ. বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম হারবী রহ. বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে দেখলাম; মনে হল যেন আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের জ্ঞান তাকে দান করেছেন।

আমদ আল্ খল্লাল রহ. বলেন, ইমাম আহমাদ ইবেন হাম্বল রহ. ফিকহের কিতাবগুলো লিখে নিতে আর মুখস্ত করতেন। এর পর আর সেগুলো পুনরায় উল্টানোর প্রয়োজন তার ছিল না।

ইমামদের মানাকেব তথা গুনাবলী ও জীবনচরিত যে কতটা মধুর তা রিজালের কিতাব অধ্যায়ন করলে স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এক ইমাম অন্য ইমামের প্রসংশায় ছিলেন

পঞ্চমুখ। অথচ তাদের মধ্যেই ছিল মাসআলা নিয়ে হাজার মতভেদ; কিন্তু তাদের সেই মতের ভিন্নতা তাদের আন্তরিকতায় কোন ফাটল ধরাতে পারেনি। বরং তাদের একে অপরের জ্ঞানের প্রসংশা করছেন।

আল্লাহ আমাদেরকে তাদের মত সুন্দর জীবন গঠন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।